সোমবার, ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ২২৩

‘ম্যান মেড বন্যা,’ জল ছাড়ায় স্পষ্ট নিয়ম থাকা দরকার

নিম্নচাপ সরলেও সর্বত্র বৃষ্টি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এখন আশঙ্কা ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে। এই জলেই দক্ষিণবঙ্গ প্লাবিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সম্প্রতি হাওড়ার আমতায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে ‘ম্যান-মেড বন্যার’ অভিযোগ তোলেন, এর আগেও তিনি এই অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগের বড় কারণ হল বিভিন্ন বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হচ্ছে। এটা বলা দরকার যে বাঁধ কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, নিয়ম মাফিক জল ছাড়ার আগে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসককে জানানো হয়। কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে তার সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে। ফি বছর এই বিতর্ক কেন হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন।

তবে ডিভিসি জল ছাড়া কমিয়েছে। তবে জল না ছাড়লে বাঁধ ভেঙে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটবে, সেটা কখনওই কাম্য নয়। কিন্তু নিম্নচাপ সরে গেলেও ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। আর এ রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত, অব্যাহত প্রাণ হানিও। গত শুক্রবারই হুগলির খানাকুলের ছত্রশালে নৌকাডুবিতে মৃত্যু হয় এক মহিলার। বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে বন্যা পরিস্থিতির সাম্যান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুরের সংকট এখনও কাটেনি। চার জেলাতেই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে।

এবারের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু জলে ডুবে মারা গিয়েছেন ১৪ জন। এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের। এছাড়া, সর্পদস্ট, দেওয়াল ভাঙা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিবছরই প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। এসব কমাতে চাই আরও সতর্কতা, মানুষকেও সচেতন হতে হবে। তেমনি চাই প্রশাসন ও বাঁধ কর্তাদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি দরকার নিরন্তর প্রয়াস মানুষের দুর্ভোগ কমাতে।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

যোগভ্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ

(মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)---‘‘ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হ’লে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? **আদাড়েগুলোর হয় না**। মলয় পর্বতের হাওয়া লাগ্‌লে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমূল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।‘‘ তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হ’লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।’’ মহেন্দ্র মুখুয্যে— কেন যোগভ্রষ্ট হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ---পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক’রতে ক’রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ’য়েছে। এরূপ হ’লে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়। মহেন্দ্র—তারপর, উপায়? শ্রীরামকৃষ্ণ- কামনা থাক্‌তে- ভোগ লালসা থাক্‌তে—মুক্তি নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব ক’রে নেবে। (সহাস্যে) তুমি কি বল?—স্বদারায় না পরদারায়? (মাষ্টার, মুখুয্যে, এঁরা হাসিতেছেন)। শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত– ঠাকুরের নানা সাধ

পূর্বকথা---প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে—গঙ্গাস্নান

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি ক’রে নিতাম। ‘‘বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ’লো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,---তারপর অসুখ।’’ ‘‘ ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম, এই অবস্থার পর সেই গোট পরথে সাধ হ’লো। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই, —গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্ শিড়্ করে উপরে বায়ু উঠ্‌তে লাগ্‌লো—সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেল্‌তে হ’লো। তা না হ’লে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে।’’ ‘‘ ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। (সকলের হাস্য)’’।

দিনপঞ্জিকা

১৪ শ্রাবণ, ভাঃ ৯ শ্রাবণ **৩১ জুলাই**,১৪ শাওন, সংবৎ ৮ শ্রাবণ সুদি, ৭জেল্কদ্‌। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১০, সূর্য্যাস্তি ঘ ৬।১৮। **সোমবার,** অষ্টমী দিবা ঘ ১১।২৮ মিঃ। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ঘ ১২।১৬ মিঃ। শুভযোগ অপরাহ্ন ঘ ৫।৪৮মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ১১।২৮ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১২।১৩ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ১২।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**-– দোষ নাই, দিবা ঘ ১২।১৬ গতে দ্বিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪৮ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ২।৫৮ গতে ৪।৩৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।২১ গতে ১১।৪৩ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ১১।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অবূঢ্যান্ন **সাধভক্ষণ** নামকরণ নিষ্ক্রমণ **গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ** দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পূণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। **বিবিধি**— নবমীর সপিন্ডন। দিবা ঘ ১১।২৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **অমৃতযোগ**-–দিবা ঘ ৬।৫৮ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪শ্রাবণ, ভাঃ ৯ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই, ১৪ শাওন,৭ জেল্কদ্ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।১৮ সোমবার। অষ্টমী দিঃ ঘঃ ১১।২৮।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সরকার ও বিজেপি’র উপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্তৃত্ব এখন অবিসংবাদিত

গৈরিক শিবিরের পরবর্তী লক্ষ্য বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে আনা

হরিহর স্বরূপ

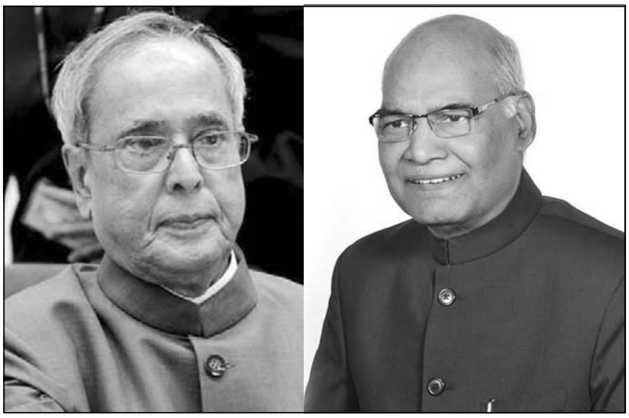

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী হিসাবে যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, সেভাবেই রামনাথ কোবিন্দ পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। অনেকেই কোবিন্দকে প্রণবের তুলনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করছেন। বলা হচ্ছে, ‘কোবিন্দ প্রণববাবুর মতো বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন নন।’ তবে রাষ্ট্রপতিভবনের বাসিন্দা বদলের মধ্যে রয়েছে এক সমাপতন। আসলে রাষ্ট্রপতিভবন কোনওভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কেন্দ্র নয়। কিন্তু, সেখানকার বাসিন্দাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে থাকে হতাশা ও উদ্বেগ। রাজনৈতিকমহলের সর্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে যে, রামনাথ কোবিন্দ হলেন মোদির ব্যক্তিগত পছন্দের লোক। তার চেয়েও বড় কথা, এমনও বলা হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী সুচারুভাবে আরএসএস নেতৃত্বের খবরদারিকে এভাবে পাশ কাটিয়েছেন। কারণ, ওই সংগঠনের পরিকল্পনা ছিল অন্য। অথচ, কোবিন্দ কট্টরপন্থী আরএসএস ব্যক্তিত্ব। কিন্তু, বিজেপি নেতৃত্ব তাঁকেবাছাই করতেন না, যদি না তাঁকে প্রধানমন্ত্রী জোরালোভাবে সমর্থন দিতেন। উদাহরণ হিসাবে সামনে থাকা অটলবিহারী বাজপেয়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোদিও পৃষ্ঠপোষক এবং গ্রহীতার সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়ে এক-পা বাড়িয়ে খেলেছেন। তার সুফলও পেয়েছেন। যে সম্পর্ক আদতে আরএসএস ও বিজেপি’র মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়টির গভীরে রয়েছে চোরাস্রোতের মতো বহমান এক বিরোধ। প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং এক স্বয়ংসেবকের শপথের মধ্যে আছে আসমান-জমিন ফারাক। যে সংগঠনের সদর দপ্তর নাগপুরে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ী শুরু থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে তিনি আরএসএস-এর আশা এবং দাবির তুলনায় অগ্রাধিকার দেবেন। কিন্তু, তার জন্য তাঁকে মূল্য চোকাতে হয়েছিল। মোদি যেভাবে খেলেছিলেন, তাতে আরএসএস-এর অন্দরে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, আজ হোক বা কাল প্রধানমন্ত্রীকে নিজের এবং নাগপুরের বসেদের মধ্যে কোথাও একটা লাইন টানতেই হতো। কোবিন্দকে বাছাই করে মোদি সেই লাইন টেনে দিয়েছেন। বিষয়টি বিনা নোটিশে হয়নি। বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর এসএস হল এমন এক হাতি, যে রয়েছে ঘরের মধ্যে। যাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। অন্যদিকথেকে দেখলে, সক্রিয় থাকতে চাওয়া প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়ার মধ্যেই রয়েছে বিস্ময়। প্রণববাবু প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে কঠিন কোনও গাঁট ছিলেন না। আবার তাঁকে ঠিক রাবার স্ট্যাম্পও বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শদাতারা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, অঙ্ক কষা চলছিল। এখন সেই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ তথা জাতীয় শক্তির ভর নিশ্চিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর দিকে ঢলে পড়ল। আসলে রাষ্ট্রপতি মুখোপাধ্যায় বারংবার সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছিলেন। জমি অধিগ্রহণে সরকারের অর্ডিন্যান্স জারি, শত্রু সম্পত্তি বিল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বহুবার মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু, তা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী পছন্দের রাষ্ট্রপতি পেয়ে গিয়েছেন। আগামী মাসে উপরাষ্ট্রপতিও পেয়ে যাবেন। এতদিন রাজ্যসভায় যে সুবিধা বিরোধীরা পেয়ে আসছিলেন, এবার তাও ব্যাপকভাবে কমে যাবে। এর কিছুদিন পরেই, আগষ্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টেও বদল আসতে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে একমাত্র এটাই সেই ক্ষমতাকেন্দ্র, যাকে সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিচারবিভাগের শক্তি ভীষণভাবে নির্ভর করে নৈতিক মূল্যবোধের উপর। বিশেষত, যাঁরা বিচারের দায়িত্ব নিয়ে আসেন। সেখানেই এখন নানা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, জোরদার এবং সক্রিয় গণতন্ত্র তখনই বজায় থাকে, যখন তা স্বাতন্ত্র বজায় রাখে, তাঁরা আশঙ্কিত। অন্যদিকে, বিচারবিভাগের প্রতিক্রিয়া এবং অন্যায় অনুমতি দিতে না চাওয়া শাসকের অপছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের নরেন্দ্র মোদির ছায়ার বাইরে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেই। এদিকে, এমন কোনও নেতা দলে নেই, যিনি সুদূর কল্পনাতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চ্যালেঞ্জার হয়ে ওঠার কথা ভাবতে পারেন। বস্তুত, বাজপেয়ী বা এল কে আদবানিও বিজেপি’র অন্দরে এমন একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম নিয়ে কিছু কথা

ড. অশনিকা ঘোষ

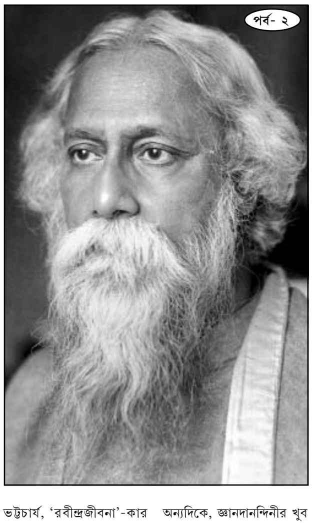

কাদম্বরীদেবী কবির বৌঠান হওয়া সত্ত্বেও দুজনের সম্পর্ক নিয়ে সেই সময়ে সৃষ্টি হওয়া বিতর্ক আজও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের (১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর) চার মাস পরে ১৯ শে এপ্রিল ১৮৮৪, কাদম্বরীদেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এবং তার দু-দিন পর ২১ এপ্রিল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এই আত্মহত্যার ব্যাপারে নীরব ছিল। মূলত, পারিবারিক সমস্যার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ব’লে বিতর্ক রয়েছে। হিন্দু প্রথানুযায়ী মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়নি, ঠাকুরবাড়িতেই বসানো হয় করোনার কোর্ট। গবেষকরা মনে করেন, স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই করোনার রিপোর্ট লোপ করা হয়, সঙ্গে ‘সুইসাইড নোট’ও। ৫২টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয় সংবাদ মাধ্যমের। তাই কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু সংবাদ তখন কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এরপর থেকে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীর পরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরে কলকাতা ছেড়ে বিহারের রাঁচির মোরাবাড়ি পাহাড়ে একটি বাড়ি তৈরি ক’রে বসবাস করতে থাকেন এবং নির্জনবাসে জীবন কাটিয়ে দেন। কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং তাঁর স্মৃতি নিয়ে মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও একাধিক কবিতা, গান ও গল্প রচনা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরীদেবীর আত্মহনন প্রসঙ্গ নিয়ে লেখালিখি শুরু হয় বহুকাল আগে, খুব সম্ভব ১৯০০ সাল। ‘সোফিয়া’ পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'The World Poet of Bengal' প্রবন্ধে কবির সঙ্গে বৌঠানের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে ‘স্পিরিট’ তার উৎসে আছে 'an excrucisting pain of an unrequited love' কবির নাতজামাই কৃষ্ণকৃপালনী কবি মানসে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্যে বলেছেন, 'It did not break him, it made him.' বিস্তৃতভাবে প্রথম ‘শনিবারের চিঠি’-তে ধারাবাহিকভাবে ‘কবি মানসী’ নামে লেখেন জগদীশ ভট্টচার্য, ‘রবীন্দ্রজীবনা’-কার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ‘ রবিজীবনী’-কার প্রশান্তকুমার পাল, ‘প্রথম আলো’ উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ গ্রন্থে চিত্রা দেব, ‘কবির বউঠান’ উপন্যাসে মল্লিকা সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র-গবেষক জ্যোতির্ময় ঘোষ, অমিত্রসূদন ভট্টচার্যপ্রমুখ লেখক কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়কে কেন্দ্র ক’রে ১২০ পাতার একটি উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখিত রচনাকারদের রচনা ছাড়া আরও অসংখ্য লেখা যে এ বিষয়ে আছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অধিকাংশ লেখা থেকে কাদম্বরীদেবীর আত্মহত্যার কারণ হিসাবে বেশ কয়েকটি ঘটনাকে উপস্থাপিত করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৮৪ সালের আগেও আর একবার কাদম্বরীদেবী আত্মহননের চেষ্টা করেছিলেন বলে কোনো কোনো গবেষক বলেছেন। তবে কাদম্বরীদেবীর আত্মহত্যার কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ করা যায়—প্রথমত ঃ সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর আধুনিকতার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আকৃষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে, জ্ঞানদানন্দিনীর খুব একটা পছন্দের ছিলেন না কাদম্বরীদেবী। তাঁর বংশ গৌরব ছিল না, ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকার শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা তিনি। নতুন বধূ হয়ে আসা কন্যার হৃদয়ে বিষয়টি নিয়ে ক্ষত তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঃ বিবাহের পর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীর প্রতি আগ্রহী হলেও ধীরে ধীরে আকর্ষণ কমতে থাকে। জ্ঞানদানন্দিনীর পরিবারের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ব্যবসা, নাটক রচনা ও অভিনয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তৃতীয়ত ঃ কাদম্বরীদেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবনে সন্তানসুখ-প্রাপ্ত না হওয়ায় বন্ধা রমনীর গুঞ্জন তাঁকে আহত করে। চতুর্থত ঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর (রবীন্দ্রনাথের দিদি) কন্যা ঊর্মিলাকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করছিলেন। বিধির নির্মম পরিহাসে সেই কন্যা সন্তানটি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। কাদম্বরীদেবীর মধ্যে অপরাধ বোধ তৈরি হয়। পঞ্চমত ঃ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাদম্বরীদেবীর একাকীত্ব তাঁকে আরও গ্রাস করে। মানসিক অবসাদের স্বীকার হন। ষষ্ঠত ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জামার পকেট থেকে বিনোদিনী নামের এক নটীর লেখা চিঠি পান, যেখানে বর্ণিত ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনোদিনীর প্রণয়লীলার চরম স্বীকারোক্তি। প্রত্যক্ষভাবে এই কারণেই জীবনদ্বীপ নির্বাপণের নিমিত্ত অফিম সেবন করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বৌঠানকে ভালবেসেছিলেন। সামাজিক দিক থেকে বিষয়টি সম্পর্শকতার। কিন্তু ‘রবীন্দ্রনাথ’ হতে কাদম্বরী দেবীর যে ভূমিকা সেটিকে কী বলা যাবে? তিনি আত্মহত্যা ক’রে প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অপরাধী ক’রে গেছেন। কিন্তু পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসায় ত্যাগ শিখতে সাহায্য করেছেন কী? জিজ্ঞাসা জাগতে পারে। ক্ষুদ্র জীবন পরিসরে এই তরুণী অবমাননার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করেছেন হতাশা আর একাকীত্ব। তিনি নিজে কিছু পাননি, রবীন্দ্রনাথকে বোধ হয় অনেক কিছু দিয়েছেন। সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রেমকে হৃদয়ের মধ্যে স্বযত্নে লালন করেছেন। কবির ‘নয়ন সমুখে’ না থেকেও ‘কবির অন্তরে তুমি কবি’ হিসাবে রয়ে গিয়েছেন। এ যেন স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা আর প্রেমের দহনে পুড়ে পুড়ে প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পবিত্র হওয়ার কারণ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। উদ্দেশ্য ছিল ওকালতি পড়া। প্রথম বিলেত যাওয়ার পূর্বে বিদেশী আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ মুম্বাই-এ একটি অবাঙালি গুজরাতি পরিবারে রবীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা করেন। পরিবারের কর্তার নাম ডাঃ আত্মরাম পাণ্ডুরঙ। এই পরিবারের কন্যা আনা তড়খড়ের (?-১৮৯১) সঙ্গে তরুণ কবির প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়। আনা রবীন্দ্র প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি বয়সে কবির থেকে দু-বছরের বড়ো ছিলেন। কিন্তু, সুদর্শন গায়ক ও কবির প্রতি আকর্ষণ তৈরি হতে দেরি হয়নি আনার। তরুণ রবিও গান শুনিয়ে, কবিতা লিখে, ‘নলিনী’ নাম দিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ বিলেত পাড়ি দেন। ডাঃ আত্মরাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও আনার বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু, মহর্ষি দেব বিষয়টিতে অসম্মত হন।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি আসতে ১০ বছর লাগে

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হবার পরেই আমরা কোনো মতেই দশম শ্রেণিতে পৌঁছে যেতে পারবো না। আমাদের প্রতিবছর একটা শ্রেণিতে পাশ করতে হবে। এই ভাবেই একটা করে শ্রেণিতে পাশ করে উঠে আসতে হবে। আবার শ্রেণি বদলাবার পর নতুন বই হাতে পেয়ে, সেই বইয়ের পড়ায় মন দিতে হবে। নতুন করে আবার লিখতে হবে। সর্বদাই নতুন, তাই তাকে জানার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। এই ভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্ত্তন করে। একদিন দশম শ্রেণিতে পৌঁছে যেতে পারবো। তারপর মাধ্যমিকে লেটার পাবো, কিংবা সব বিষয়ে একশো পাবো, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের পড়াশোনার ওপর। একটা শিশু এই সবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে এবং প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম হয়েই এসেছে। তার পক্ষে এখনই সম্ভব নহে দশম শ্রেণিতে পৌঁছে যাবে। তাকে সুযোগ দিতে হবে। সে কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে, কেমন পরীক্ষার মান করছে, তারপর নয় ভেবে দেখা যাবে। বর্তমানে তার মান প্রথম বিভাগেই রয়েছে। তারপরেও কেন এত হৈ চৈ করছে। কেন একশোয় একশো পাওয়া সেই শিশুটিকে টি.সি. দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কেনই বা বলা হচ্ছে টুকে পাশ করেই শিশুটি প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত এসেছে। এখানে যে কথাটি পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেই কথাটি হলো ঈর্ষা। এতদিন প্রথম বেঞ্চে বসে এসেছে! তাই আজ যখন পিছন বেঞ্চে বসতে হয়েছে, সেই ঈর্ষার কারণেই ছোট্ট শিশুটার টি.সি. চাইছে, যাতে আবার প্রথম বেঞ্চে এসে বসতে পারে। এটা তো সম্ভব নহে। একদিন পিছন বেঞ্চে বসেই অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। সে দিনটার কথাগুলো কী মনে পড়ে না। এখন যখন সেই ছোট্ট শিশুটা ভাল পড়াশোনার পর প্রথম বেঞ্চে এসে গেছে, তখন গায়ের জ্বালা মেটাতে প্রিন্সিপালের কাছে দরবার করছে। এই শিশুটার টি.সি. চাই। এটা তো হতে পারে না, তাই প্রথম বেঞ্চে বসে। আর প্রথম হয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যেতে দশ বছর লাগবে। এটা বোধ হয় পিছনের সারিতে বসা ছাত্ররা ভুলেই গেছে। এটা পিছন সারিতে বসা ছাত্রদেরও লজ্জার।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

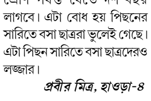

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়